লুই ব্রেইল

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

আমার প্রথম বই হেলেন কেলার যখন প্রকাশিত হয় তখনই প্রথম লুই ব্রেইলের চমকপ্রদ জীবনকথা জানবার সুযোগ হয়। ক্রমে ব্রেইলকে এতটাই ভালোবেসে ফেলি যে ব্রেইলে ইংরেজি বর্ণমালা লেখবার পদ্ধতি শিখে ফেলি। সেইসঙ্গে জানতে পারি কোটি কোটি মানুষকে দৃষ্টিহীনতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত পথে নিয়ে আসতে একজন কিশোর কীভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। আজ বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবদরদি যুগপুরুষের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী আসন্ন। সমগ্র বিশ্ব গভীর শ্রদ্ধায় লুই ব্রেইলের জন্মের এই শুভ মুহূর্তটি স্মরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমিও কাঠবেড়ালির মতো অতি ক্ষুদ্র একটি ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছি। তাই এই মহান প্রাণের জীবনকথা ও তাঁর সারা জীবনের কর্মসাধনার কাহিনি বাংলায় লিখতে প্রয়াসী হয়েছি।

লুই ব্রেইল সম্পর্কে বহু চেষ্টা করেও যখন কোনো তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারছি না তখন ব্লাইন্ড পার্সনস অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী সৈকত কর আমাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভ্রাতৃপ্রতিম সৈকতের কাছে আমার ঋণ

অপরিশোধ্য। কল্যাণীয় বোধিসত্ত্ব রায় বিদেশ থেকে তথ্যসমৃদ্ধ বই সংগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দেওয়ায় আমার কাজ সহজ হয়েছে। কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অশোক চৌধুরী মহাশয় আমাকে ব্রেইলের একটি জীবনীগ্রন্থ লিখতে বহু দিন থেকেই অনুরোধ করছেন। এই বইটির সঙ্গে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হওয়ায় বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রতিও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বিশ্বের বিস্ময় হেলেন কেলার এবং লুই ব্রেইল কেবল দৃষ্টিহীন মানুষের কাছে নন পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই প্রেরণার উৎস। জীবনের চরম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেমন ভাবে নিজের জীবন ও যৌবন আশাহত মানুষের মুক্তির জন্য উৎসর্গ কবা যায় এবং নিজেকে সাফল্যের শিখরে তুলে ধরা যায় সে-কথা লুই ব্রেইলের তেতাল্লিশ বছরের জীবনকাহিনির ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গ্রন্থতীর্থের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক মহাশয় আমার অন্যান্য বই-এর মতোই এই বই-এর অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকের মতো দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁর আনুকূল্যেই বইটি যথা সময়ে প্রকশিত হতে পারল।

জোকা
কলকাতা-৭০০ ১০৪

স্বপন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

আজ থেকে দুশো বছর আগে মঁসিয়ে লুই ব্রেইল দৃষ্টিহীনদের জন্য লিপি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিহীনদের কাছে জ্ঞানের স্বর্ণভাণ্ডার উন্মোচন করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই অনবদ্য আবিষ্কারের সুফলে দৃষ্টিহীনদের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কে এই মঁসিয়ে লুই ব্রেইল? কার পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় তিনি এই সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন? তাঁর জীবদ্দশাতে তিনি তাঁর এই বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন কি? তাঁর জীবনপঞ্জিকা বাঙালি পাঠকের কাছে কতখানি জানা আছে? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে গ্রন্থকারের আলোচ্য পুস্তকটি ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে গ্রন্থকার স্বপন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'হেলেন কেলার' বইটিও ইতিপূর্বে পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। শুধু সাধারণ অক্ষরে বইটির মুদ্রণ হয়নি, সেই সঙ্গে বইটির ব্রেইল রূপান্তর হয়েছে। আমি সেই বইটি পড়ে এতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যে তাঁর মঁসিয়ে ব্রেইলের উপর এই নতুন বইটির ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

যিনি বিশ্বের সকল দৃষ্টিহীনের জীবনকে আলোকিত

করলেন, তাঁর জীবনী কিন্তু অনেকেরই অজানা। ব্রেইল-লিপি আমরা সকলেই ব্যবহার করি কিন্তু তাঁর অন্তরালে যে মানুষটির অকুণ্ঠ পরিশ্রম রয়েছে, তার কথা আমরা কতটুকু জানি? "যে চাঁদ ও তারকা রাত্রির দীপালি সাজিয়ে আঁধারের দুঃখ দূর করে, দিনের আলোয় কি তারা পরিচয়হীন?" লুই-এর জীবনকথা কতকটা তেমনই। আমরা সকলেই ব্রেইল-লিপি ব্যবহার করি কিন্তু তার অন্তরালে যে অদৃশ্য মানুষটির সারা জীবনের সাধনা রয়েছে তা আমরা কতটুকু জানি?

ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু তাঁর জীবনকাহিনি লেখা হয়েছে কিন্তু সেইসব বই এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ যে সব পাঠক তা সংগ্রহ করতে পারেন না। গ্রন্থকারের এই বইটি পড়ে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। সম্ভবত বাংলাভাষায় লুই-এর জীবনকাহিনি নিয়ে গ্রন্থকারের এটি এক অভিনব প্রচেষ্টা। আমি এই অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

বাঙালি পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে শিশু বয়সেই নিঠুর নিয়তির হাতছানিকে উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে লুই অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবনের রঙ্গমঞ্চে। অধ্যয়ন শেষ করে কঠোর অধ্যবসায় ও সহনশীলতাকে আঁকড়ে ধরে গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বার্বিয়ারের বারোটি বিন্দুকে মাত্র ছটি বিন্দুতে কমিয়ে এনে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর এই যুগান্তকারী ব্রেইল-লিপি।

আজ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেই জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করা হয়েছে। মৃত্যুর একশো বছর পরে এই জ্ঞানতপস্বী সমাদৃত হলেন। ফ্রান্সের নগণ্য গ্রাম কুভ্‌রে থেকে তাঁর দেহাবশেষ তুলে নিয়ে এসে সসম্মানে প্যারিসের প্যানথিয়নে বহু ফরাসি-রত্নের পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁর দুইশত জন্মবার্ষিকীতে আমরা জানাই আমাদের প্রাণের প্রণাম। পরিশেষে যবনিকা টেনে বলতে পারি —

"We have lost but heaven has gain'd
One of the best, the world contain'd"

১৪ নভেম্বর ২০০৮
বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬০

অশোক চৌধুরী
প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়

সূচিপথ

দুর্ঘটনায় দৃষ্টিহারা বালক লুই ব্রেইল	১৭
প্যারিসের প্রথম অন্ধ-বিদ্যালয়ে ব্রেইল	৩৫
কিশোর ব্রেইলের যুগান্তকারী আবিষ্কার	৬৫
দৃষ্টিহীনদের জন্য ডট-পদ্ধতিতে লিখন ও পঠন	৭৫
যক্ষ্মায় আক্রান্ত লুই	৮৯
ব্রেইল পদ্ধতির প্রথম স্বীকৃতি	১০৪
অন্তিম শয্যায় লুই ব্রেইল	১২৪
সমগ্র বিশ্বে দৃষ্টিহীনদের আলোকবিভা ব্রেইল	১৩৫
দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সময়-সারণি এবং লুই ব্রেইল জীবনপঞ্জি	১৫১

দুর্ঘটনায় দৃষ্টিহারা বালক লুই ব্রেইল

ফ্রান্সে তখন নেপোলিয়ানের যুগ। ফরাসি বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলিকে অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্রান্স ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসছে। শাসনের রশিটি এক প্রতিভাধর দূরদর্শী ও দুঃসাহসিক রাষ্ট্রনেতার হাতে — তিনি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ট্রাজিক নায়ক।

নেপোলিয়ান নিজে তাঁর সেনাদলের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা এবং গোপনতা বজায় রেখে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা ছিল তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর সেনা বিভাগের কেউ নতুন কোনো কৌশলের সন্ধান দিতে পারলে নেপোলিয়ান খুব খুশি হতেন। নেপোলিয়ানের গোলন্দাজ বিভাগের এক ক্যাপটেন চার্লস বারবিয়ার (Charles Barbier) রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সৈনিকদের

ক্যাপ্টেন চার্লস বারবিয়ার

নির্দেশ পাঠানো এবং সেই নির্দেশ পাঠের জন্য এক চমকপ্রদ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। একটু মোটা কাগজে ফুটো করে কতকগুলি উঁচু-উঁচু ডটের সাহায্যে কয়েকটি ধ্বনিসংকেত পাঠিয়ে দেওয়া হত। অন্ধকারেই অনেকটা

এম্‌ব্রয়ডয়ারির মতো করে সেই ধ্বনিসংকেত তৈরি হত। আর সৈনিকরা অন্ধকারের মধ্যে কাগজের উপর আঙুল বুলিয়ে ডট-গুলির সংখ্যা ও অবস্থান থেকে সেই সাংকেতিক নির্দেশ পড়ে ফেলতে পারতেন। চোখ এবং আলোর সাহায্য ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পেয়ে যেতেন সৈনিকরা। শুধু অন্ধকারে পড়ার জন্য নয়, বার্বিয়ারের আবিষ্কারের পেছনে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও খুব গুরুত্ব পেয়েছিল। নেপোলিয়ান যখন স্পেনের যুদ্ধে ব্যস্ত তখন এই বার্বিয়ারের সাংকেতিক লিপির সাহায্যে তাঁকে খবর পাঠানো হয় যে অস্ট্রিয়া রাইন অঞ্চল আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বার্বিয়ার প্রকাশ করলেন তাঁর পুস্তিকা ঃ "Tableau d'Expe'diographie." প্রথমে ব্যবহার করা হল কলম বা পেনসিলের বদলে একটি ছুরি। এই ছুরি দিয়ে কাগজ কেটে দাগ সৃষ্টি করা হল। আর হাতের স্পর্শে সেই কাটা-দাগ অনুভব করা সম্ভব হল।

তেরো-চোদ্দো বছর পরের দৃশ্য। ফ্রান্সের প্রথম অন্ধ বিদ্যালয়ে একটি অন্ধ বালক স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডার মধ্যে গভীর রাতে তার বিছানার উপর বসে বসে এক মনে কাগজের মধ্যে একটি সুচের মতো যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে চলেছে। মাঝে মাঝে আঙুল বুলিয়ে কাগজের উলটো দিকে কি যেন অনুভব করছে। বাইরে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। সহপাঠী অন্ধ বন্ধুরা ঘুমে আচ্ছন্ন। চারিদিক নিস্তব্ধ, এরই মধ্যে ঘুম নেই অন্ধ বালকটির। সে

একাগ্রমনে আপন পরীক্ষায় মগ্ন। প্যারিসের এই অন্ধ বিদ্যালয়ে সে এসেছে বছর তিনেক আগে। ১৮১৯-এ সে যখন প্রথম এই বিদ্যালয়ে দশ বছর বয়সে ভরতি হয় তখন জানতে পারে যে বার্বিয়ার নামে এক ভদ্রলোক অন্ধদের লেখবার এবং পড়বার জন্য একটি কাগজের উপর কতকগুলো ডটের মতো ফুটো সৃষ্টি করে লেখন ও পঠন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ১৮২১ সালে তাদের অন্ধ বিদ্যালয়ে এসে বার্বিয়ার তাঁর পদ্ধতি অবলম্বন করে কেমন ভাবে অন্ধ বালক-বালিকারা লিখতে-পড়তে পারে তা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলেন। দৃষ্টিহীনদের হাতে বর্ণপরিচয়ের হাতিয়ার তুলে দেওয়ার এই ভাবনা অন্ধ বালকটির মাথার মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। তার মনে হচ্ছে বার্বিয়ারের পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলো জটিলতা রয়েছে। বার্বিয়ার নিজে চক্ষুষ্মান বলে দৃষ্টিহীনদের বাস্তব অসুবিধেগুলি ঠিক বুঝতে পারছেন না। অথচ এই পদ্ধতির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। রাতের পর রাত বালকটি নেশাগ্রস্তের মতো একমনে পরিশ্রম করে চলেছে। সহপাঠী দৃষ্টিহীন বালকরা তার এ পাগলামিকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা উঁচু-উঁচু করে ছাপা সাধারণ বর্ণমালার উপর হাত বুলিয়ে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করে। চক্ষুষ্মানরাও সেই বর্ণমালা পড়তে পারে, বুঝতে পারে। তাই তারা তাদের বন্ধুর নতুন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুবই উদাসীন। কিশোর অন্ধ আবাসিক ছাত্রটি কিন্তু কিছুতেই নিরুৎসাহিত

হবার পাত্র নয়। অদম্য তার প্রাণশক্তি। এই ছেলেটিরই নাম লুই ব্রেইল। একদিন এই অন্ধ বালকটি সারা বিশ্বের কোটি কোটি দৃষ্টিহীনকে আশাহীন অনন্ত অন্ধকার থেকে আনন্দিত আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য আবিষ্কার করেন ব্রেইল লিখন ও পঠন পদ্ধতি। আজ প্রায় দুশো বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষার দৃষ্টিহীন মানুষদের সামনে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকশিখাটি যিনি ধরে আছেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত দৃষ্টিহীন মানুষের আত্মার আত্মীয় লুই ব্রেইল।

ফ্রান্সের প্যারিস থেকে পুবে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট শান্ত কিন্তু সমৃদ্ধ গ্রামের নাম কুভরে (Coupvray)। মার্ন (Marne) নদীর উপত্যকায় গাছে গাছে ভরা দিগন্তব্যাপী গমের খেতের পাশে এই গ্রামটি। আঙুর খেতের জন্যও গ্রামটির খুব খ্যাতি। চাষবাস গ্রামের মানুষদের প্রধান জীবিকা। তাদের কাজকর্ম যাতে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করতে গ্রামীণ কুটিরশিল্পও ছিল অনেক। একেবারে স্বনির্ভর একটি গ্রাম। কামার-কুমোর-তাঁতি যেমন আছে তেমন আছে ডাক্তার কবিরাজ। নিজেদের জীবনযাত্রার জন্য খুব প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে যেতে হয় না। এই গ্রামের খুব পরিচিত একটি নাম সাইমন রেনে ব্রেইল (Simon Rene' Braille) । সে ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম তৈরির মাস্টার। তাঁর বাবা গ্রামে এই ব্যাবসার সূত্রপাত করেন। সাইমন সুন্দর একটি কারখানা গড়ে তোলেন, সেখানে ঘোড়ার জিন,